সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

# কাজী নজরুল ইসলামের গল্পসাহিত্য : স্বাতন্ত্র্য ও সীমাবদ্ধতা

**মো. রাফাত আলম মিশু***

[সারসংক্ষেপ: গল্পসাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম স্বল্প আলোচিত নাম। বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পের পরিণত পর্যায়ে গল্পকার নজরুলের আবির্ভাব। নজরুলের সমকালে অন্যান্য গল্পকারদের ধারা থেকে তাঁর গল্প লেখার পথ ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে স্বতন্ত্র। তাঁর গল্প আদৌ গল্প হয়ে উঠেছে কিনা এ-নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে; আরও আলোচনার সুযোগ আছে। বিষয় ও প্রকরণ দ্বিবিধ দিক সাহিত্যবিবেচনার নতুন নতুন প্রবণতা অনুযায়ী নজরুলকৃত গল্পগুলো পর্যালোচনা করে কথাসাহিত্য ও গদ্যচর্চায় নজরুল-মানসের অনুদ্ঘাটিত দিকগুলো অনুধাবন করা সম্ভব। প্রচলিত প্রকরণনিষ্ঠা থেকে বেরিয়ে নজরুলের গল্পপাঠ পাঠক-মানসে যোগ করে সাহিত্যপাঠের নবতর মাত্রা।]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথমত কবি ও প্রধানত কবি। নজরুল-সাহিত্যের সমগ্রটা জুড়ে দৃঢ়ভাবে বিরাজমান থাকে তাঁর কবিসত্তা। রোম্যান্টিক 'আমি'র জাগরণের মধ্য দিয়ে এই সাহিত্যসত্তার উন্মেষ এবং পরিণতিতে তা রূপ নেয় সঙ্ঘচেতনার প্রতিশ্রুতিতে। কবি-নজরুল একই সঙ্গে গল্পকারও। বলা বাহুল্য, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২২) একটি গল্পগ্রন্থ। তিনটি গল্পগ্রন্থ *ব্যথার দান*, *রিক্তের বেদন* (১৯২৪) ও *শিউলিমালায়* (১৯৩১) নজরুলের গল্পের সংখ্যা আঠারোটি, অগ্রন্থিত একটি ('বনের পাপিয়া')। কবি-নজরুলের প্রভাব ও প্রতাপ বাংলা সাহিত্যে এতোই প্রবল ও দিগন্তবিস্তারী যে, গল্পকার-নজরুলকে নিয়ে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। আদৌ নজরুল ইসলাম গল্প লিখেছেন কিনা এমন প্রশ্ন ও দ্বিধাও কোনো কোনো নজরুল-সমালোচকের মধ্যে প্রকাশ পায়। নজরুল এমন এক সময়-খণ্ডে আবির্ভূত হয়েছেন, যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগ পেরিয়ে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা, সাহিত্যিক মতবাদ, প্রকরণকৌশল আত্মীকৃত করে নিয়েছে। 'নজরুল যখন গল্প লেখা আরম্ভ করেন তার আগেই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের মান বেশ উঁচু ছিলো। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর লেখা বিভিন্ন

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.9

মেজাজের গল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও বাচনের উজ্জ্বল পার্থক্যের গল্প – পাঠকের মনকে বৈচিত্র্যময় সম্পদে ভরে দিয়েছিলো।' (রুশ্‌দ ১৯৯২ : ১৪৭) রবীন্দ্রগল্পের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্প তার একটি স্বীকৃত অবয়বও পেয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধের অভিঘাত ইয়োরোপের পাশাপাশি কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও আঘাত হেনেছিল। উনিশ শতকের বোদলেয়ার, র‍্যাবো, মালার্মে ও বিশ শতকের টি এস এলিয়টের কাব্যাদর্শের প্রভাবে ও রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হবার সচেতন চেষ্টায় একদল কবিকুলও তখন চেষ্টারত। এই প্রবণতা গল্পরচনায় অব্যাহত রেখেছিলেন জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই ধারাবাহিকতায় নজরুলের গল্পসাহিত্যের স্থান কোথায়? এই প্রশ্নটি আরও বেশি জেগে ওঠে যখন কোনো কোনো নজরুল-গবেষক গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে দিশা হারিয়ে ফেলেন। তাই প্রচলিত মাপকাঠিতে নয়, বরং স্বাতন্ত্র্যের মানদণ্ডে নজরুলের গল্পবিচার বর্তমান লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর গল্পে স্বাতন্ত্র্য ও সীমাবদ্ধতার সূত্রসন্ধান একটি যুগপৎ প্রক্রিয়া।

**এক.**

নজরুলের গল্পের আলোচনায় পূর্বসূরি নজরুল-গবেষকদের কয়েকটি মন্তব্য দিয়ে নজরুলের গল্প সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা নেওয়া যেতে পারে। নজরুলের অন্যতম প্রধান জীবনীকার সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর *নজরুল-চরিতমানস* গ্রন্থে উল্লেখ করছেন, 'ছোটগল্প-রচয়িতা হিসাবে নজরুল বাঙলাসাহিত্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী নন।' (সুশীলকুমার ১৩৮৪ : ২৮৭) আবদুল হক বলেন, 'গল্পলেখকের সংযম, পরিমিতিবোধ ও শিল্পচেতনা তাঁর ছিল না।' (আবদুল ১৯৬০ : ১৪৩) রাজিয়া সুলতানা তাঁর *কথাশিল্পী নজরুল* গ্রন্থে বলছেন, 'বাস্তব জীবনের রিক্ততা, কাঁচা বয়সের উচ্ছ্বাসের আবরণ গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ গল্পের রসনিষ্পত্তি তখন লেখকের শিক্ষানবিশীয় পর্যায়ে।' (রাজিয়া ২০০০ : ৮৩) 'ছোটগল্পের রূপ, রীতি, প্রয়োগ-কুশলতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ঐ বয়সে লেখক স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্তে আনতে পারেননি।' (রাজিয়া ২০০০ : ৮৪) আবার *ব্যথার দান* গ্রন্থের নামগল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'ছোট গল্পের কিছু লক্ষণ থাকলেও 'ব্যথার দান' গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর গল্পহীনতা।' (রাজিয়া ২০০০ : ৭৫) অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, '*ব্যথার দান*-এর দ্বিতীয় গল্প 'হেনা'কে ঠিক গল্প বলা যায় না।' (রাজিয়া ২০০০ : ৭৬) এমন মন্তব্যগুচ্ছকে সামনে নিয়ে নজরুলের প্রথাগত গল্পবিচার নিঃসন্দেহে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

**দুই.**

যদিও ছোটগল্পকে বলা হচ্ছে সাহিত্যের আধুনিকতম রূপকল্প, তথাপি একথা স্বীকার্য যে, পৃথিবীর অপরাপর জাতির মতো গল্পের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক প্রাচীন ও সুনিবিড়। প্রাচীন কাব্য ও নাটক থেকে শুরু করে মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, গাথা,

পালা, রূপকথা, উপকথা, কিস্‌সা সবকিছুর অন্তর্কাঠামোতে বিদ্যমান থাকে গল্প। লৈখিক সাহিত্যের আলোচনায় ছোটগল্প হিসেবে যে শাখাটির একটি বিশিষ্ট ফর্মরূপে আবির্ভাব ঘটেছে, কালের বিচারে তা হয়তো নবীন, কিন্তু মৌখিক সাহিত্যে গল্পের উপস্থিতি অনেক পুরোনো। বলা যায়, হৃদয়সংবেদী মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহে গল্পের উপস্থিতি অনেকটা প্রত্নপ্রতিমার মতো। অর্থাৎ জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা ও কথকতা মানুষের জীবনেরই অংশ এবং বহুযুগ ধরে তা চর্চিত। সেই বিচারে একজন লেখক কী পদ্ধতিতে গল্প লিখেবেন তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কাব্যসাহিত্যসহ অপরাপর সকল সাহিত্যই উনিশ ও বিশ শতকে অবয়ব লাভ করেছে ইয়োরোপীয় তথা ঔপনিবেশিক সাহিত্যাদর্শের অনুসরণে। আর নজরুলের বি-ঔপনিবেশিক মননঋদ্ধ রচনা কবিতা-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ যে উপনিবেশিত রুচির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হবে, এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মোহাম্মদ আজমের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন :

> উপনিবেশ আমল ও উপনিবেশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যেসব নন্দনতাত্ত্বিক মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, তার সীমায় নজরুল সাহিত্যের কিছু পৌনঃপুনিক উপাদান ঠিকমতো আঁটে না। (আজম ২০১৭ : ২৫৭)

তাই নজরুলের গল্প একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। এক্ষেত্রে নজরুলের আত্মজীবন, তাঁর সৈনিকসত্তা, তাঁর বি-ঔপনিবেশিক অবস্থান ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ গল্পবিচারের উপাদান হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে। উপনিবেশের মধ্যে অবস্থান করেও উপনিবেশের বিরুদ্ধে সরব হতে নজরুলের চেয়ে বেশি আর কোনো কবি-লেখককে দেখা যায় না। নজরুল আবেগের বশবর্তী হয়ে উপনিবেশ-বিরোধিতা করেননি, তিনি উপনিবেশের ফাঁদগুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং অকপটে প্রকাশ করেছেন। আর এই সূত্রে তিনি কেবল রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের মধ্যেই উপনিবেশবিরোধিতা ও পূর্ণস্বাধীনতার দাবি সীমাবদ্ধ রাখেননি। নজরুল তাঁর সামগ্রিক জীবনাচরণের মধ্যে লালন করেছেন বি-উপনিবেশিত চেতনা, যার প্রকাশ হিসেবে আরোপিত ও প্রচলিত সাহিত্য-প্রকরণকে এড়িয়ে বা অস্বীকার করে নির্মাণ করেছেন নতুন ও স্বকীয় আঙ্গিক-রীতি। এর প্রকাশ ঘটেছে গল্প-রচনার ক্ষেত্রেও। তাই *ব্যথার দান* ও *রিক্তের বেদনের* গল্পগুলো স্থান পায় বাংলা সাহিত্যের দলছুটের দলে। 'ব্যথার দান' গল্পে দারা-বেদৌরা-সয়ফুলমুল্‌কের স্বগতোক্তিতে ও উত্তমপুরুষের প্রাধান্যে গল্পের ভেতর জন্ম নেয় কবিতার ব্যঞ্জনা। 'কবিত্বময় ও ধোঁয়াটে' (রাজিয়া ২০০০ :৮১) এ ভাষা আরও একবার মনে করিয়ে দেয় – উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গদ্যের নবযাত্রার আগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম ছিল কাব্য।

**তিন.**

নজরুলের গল্প সম্পর্কে প্রথম অভিযোগ করা যায় অর্ন্তবাস্তবতার অনুপস্থিতি এবং বহির্বাস্তবতা ও উচ্ছ্বাসের আধিক্য। এই বিতর্ক পুরোনো। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই বিতর্কের সূত্রপাত ধরা যায় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত *আলালের ঘরের দুলালের* (১৮৫৮) কাল থেকে। অনেকে *আলালের ঘরের দুলাল*কে সার্থক উপন্যাস বলতে চান না। এর কারণ – তাতে বহির্বাস্তবতার প্রাবল্য। এরই বিপরীতে রচিত হলো প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)। শোনা গেল অশ্বারোহীর পদাঘাতের নতুন ধ্বনি। এরপর উপন্যাস-শিল্প এগিয়েছে অনেকদূর। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, কোন বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ, কোন সংকট সাহিত্যে আবশ্যিক, অন্তর নাকি বাহির? এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সামনে দাঁড়িয়েও। এই সংকট দেখা দেয় কলকাতা শহরকেন্দ্রিক অন্তর্বাস্তবতাদীর্ণ কথাসাহিত্য পাঠ-পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রেও। সাহিত্য বাস্তবতা নিয়েই এগোয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় – বর্হিবাস্তবতার মুখোমুখি না হয়ে অন্তর্বাস্তবতায় কীভাবে যাওয়া সম্ভব? আর জীবনে ও সমাজে যখন বর্হিবাস্তবতাই প্রধান সংকট হিসেবে বর্তমান থাকে, তখন তার মীমাংসাই সাহিত্যস্রষ্টার প্রধান অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠার মুহূর্তে প্যারীচাঁদ তাঁর *আলালের ঘরের দুলালে* সেই কাজটি করতে চেয়েছিলেন। একই কাজ করতে হয়েছিল বাংলাদেশের লেখকদের সাতচল্লিশ-পরবর্তী নতুন পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠা বহির্বাস্তবতার মোকাবেলায়। অন্যদিকে অন্তর্বাস্তবতার সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিতে হয়েছিল ইতিহাসের শরণ, কখনো তা দূর-অতীতের কখনো বা দূরতম অতীতের। আর বিশ শতকের আধুনিকতাবাদীদের রোমন্থন করতে হয়েছিল ফ্রয়েড-মার্কসের মতো পাশ্চাত্য তত্ত্বের জগতে। এক অর্থে বহির্বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্য দিয়েই বাঙালিকে তার দীর্ঘ সময় পার করতে হয়েছে। অন্তর্বাস্তবতা এসেছে বহির্বাস্তবতার পরিপূরক হিসেবে। তাই দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই বাস্তবতার যুগ্মীভবন, মনসামঙ্গলকাব্যে সামন্তশ্রেণি ও বণিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ বহির্বাস্তবতার কাঠামোতেই ধরা দেয় অন্তর্বাস্তবতা। নজরুল সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর কালের প্রধান প্রধান বাস্তবতা – বিশ্বযুদ্ধ, বামপন্থী আন্দোলন, দারিদ্র্য, পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতিকে সামনে রেখে এগিয়েছেন। 'শিল্পসৃষ্টি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অথবা ব্যক্তি হিসেবে জীবন যাপন করা – সব ক্ষেত্রে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত, সজ্ঞাবাদী এবং বহির্মুখী। আরোপিত তত্ত্ব, মননবুদ্ধির কূটতর্ক কিংবা দার্শনিক স্থিরতা তাকে চালিত করে নি।' (আকতার ১৪০৭ : ১০৪) এজন্য কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য তাঁকে 'সমকালীন হৈচৈয়ের কবি' বলে এক পাশে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সমকালকে অস্বীকার করা নজরুলের পক্ষে ছিল অসম্ভব। সমকালকে

ধারণ করবার প্রয়োজনেই তাঁকে হতে হয়েছিল বহির্বাস্তবমুখী। নজরুল-সাহিত্যাদর্শের মধ্যে তাঁর দারিদ্র্যময় শৈশব-কৈশোর, বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, উপনিবেশ বিরোধিতা অনিবার্যভাবেই মিশে থাকে, যা তাঁর সাহিত্যসৃজনকে করে তোলে বহির্বাস্তবতার মুখোমুখি।

**চার.**

নজরুলসাহিত্যের প্রধান রসদ জুগিয়েছে নজরুলের বৈচিত্র্যময় জীবন। কবিতার মতো গল্পেও আবিষ্কার করা যায় নজরুলের নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনবীক্ষণ। নজরুল-জীবনীকাররা (সুশীলকুমার গুপ্ত, হারাধন দত্ত, আবদুস সামাদ, জিয়াদ আলী, আবদুল কাদির, রফিকুল ইসলাম) জানাচ্ছেন, নজরুলের প্রথম পাঠগ্রহণ চুরুলিয়া অধিবাসী বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়, পাঁচ বছর বয়সে (১৯০৪), এরপর ছয় বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন স্থানীয় মক্তবে (১৯০৫), দশ বছর বয়সে (১৯০৯) তিনি মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১০ সালে তিনি সেই মক্তবে একবছর শিক্ষকতা করেন। জনশ্রুতি রয়েছে তিনি বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে ইমামতি (মুয়াজ্জিন) ও হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেমও ছিলেন। (রফিকুল ২০১৫ : ১১) চুরুলিয়ার মক্তবের শিক্ষক মৌলবি কাজী ফজলে আহম্মদের সান্নিধ্যে নজরুলের আরবি-ফারসি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় (রফিকুল ২০১৫ : ১৩)। এরপর নজরুল যোগ দেন গ্রামীণ লেটো দলে। এই লেটো দলে যোগদান নজরুলের আরেকটি দিগন্তকে উন্মুক্ত করে। 'যাত্রাগান ও কবির লড়াইয়ের মিশ্ররূপ লেটো' (রফিকুল ২০১৫ : ১৪) এই সময়পর্বে (১৯১১-১৯১২) নজরুলকে লেটো দলের হয়ে অনেক পালায় অভিনয় করতে হয়েছিল, অনেক পালা রচনাও করতে হয়েছিল। 'আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যেই তিনি কৈশোরেই লেটোর দলে যোগ দেন।' (মোবাশ্বের ১৯৬৯ : ৫) এই লেটোর দলে যোগদানের ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাংলার চিরায়ত পুরাণের সঙ্গে তার গভীর পরিচয় ঘটেছিল, যা তাঁর সাহিত্যিক মনন গঠনে ও দেশজ সাহিত্যরুচি নির্মিতিতে রেখেছিল অবচেতন-ভূমিকা । একই সঙ্গে মক্তবে আরবি-ফারসিপাঠ পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কেও তাঁকে সজ্ঞান করে তুলেছিল; এবং এটি আরও পূর্ণতা পেয়েছে সৈনিকজীবন-বরণে। এ প্রসঙ্গে নজরুলজীবনীকার রফিকুল ইসলামের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

> লেটো দলে পালা নাটক রচনা বালক নজরুলকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। কেবল দ্রুত গান বা নাটক রচনা নয়, হিন্দু পুরাণ, ইতিকথা এবং ঐ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এই সময়। পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে হিন্দু ঐতিহ্য এবং বাংলার গ্রামীণ ও লোকসংস্কৃতি থেকে উপাদান আহরণ মুসলিম ঐতিহ্যের পাশাপাশি সেগুলোর ব্যবহারে যে স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয় তার সূত্রপাত দেখতে পাই লেটো দলের জন্য নজরুলের রচনার মধ্যে। (রফিকুল ২০১৫ : ১৪)

নজরুলের ঐতিহ্য-চেতনার এই দুই দিক, রফিকুল ইসলাম বলেছেন 'হিন্দু পুরাণ' ও 'মুসলিম ঐতিহ্য', সেগুলোকে চিহ্নিত করা যায় যথাক্রমে 'ভারতীয় ঐতিহ্য' ও 'পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য' হিসেবে। নজরুল রুটির দোকানে কাজ করেছেন। এরপর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর আশ্রয়ে ময়মনসিংহের দরিরামপুরের স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কাজী সাহেবের গ্রামের বাড়িতে নজরুল জায়গির থাকতেন। কাজী সাহেবের বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে হতো পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। 'ঐ গ্রামে বা স্কুলে নজরুলের বিশেষ কোনো বন্ধু ছিল না, গ্রামের বখাটে ছেলেরা অবশ্য তাঁকে বেশ জ্বালাতন করতো।' (রফিকুল ২০১৫ : ২৪) নজরুলের কৈশোরক জীবনের এই ঘটনাগুলোর প্রকাশ দেখা যায় তাঁর *শিউলিমালা* গল্পগ্রন্থের 'অগ্নি-গিরি' গল্পের চরিত্রবিন্যাসে। বিশেষত, 'এ গল্পের নায়ক ত্রিশাল মাদ্রাসার ছাত্র সবুর আখন্দ চরিত্রটির কল্পনায় নজরুলের দরিরামপুর জীবনের ছায়াপাত করেছে।' (রফিকুল ২০১৫ : ২৫)' নজরুল সাহিত্য রচনায় আত্মজীবনকে হুবহু অনুসরণ করেননি। এই গল্পেও তেমনি জীবনের নির্যাসটুকু নিয়েছেন, এরপর মিশিয়েছেন সৃজনী। তাই গ্রামের নাম দরিরামপুর থাকলো না, হয়ে গেল বীররামপুর। আর গল্পের পরিণতিতে যে মুহূর্ত তৈরি হলো, তা নজরুলের গল্পকার সত্তায় সর্বদা বিরাজমান করুণ রসনিষ্পত্তি বা ট্র্যাজিক পরিণতি।

কাজী নজরুল ইসলাম সিয়ারসোল রাজ-স্কুলে দশম শ্রেণিতে প্রিটেস্ট পরীক্ষা চলাবস্থায় '১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান।' (কাদির ১৯৮৯ : ২) স্বেচ্ছায় বরণ করেন সৈনিক জীবনের মতো এক চ্যালেঞ্জিং জীবন। ব্রিটিশবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কেন নজরুল ব্রিটিশ-সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন, তা নিয়েও আছে নানা অভিমত। মূলত বাঙালির 'ভীরুত্বের অপবাদ' ঘুচাতে ও রোমাঞ্চকর জীবনের হাতছানিতে সাড়া দিতেই তিনি ব্রিটিশ-সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে 'রিক্তের বেদন' গল্পের বাঙালি যুবক সৈনিকের জবানিতে। সে বলছে, 'কষ্টিপাথরের মত সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোক যাচাই ক'রে নিবে যে, বাঙ্গালিরাও বীরের জাতি।' নজরুলের সৈনিকসত্তায় দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

নজরুল-জীবনীকাররা মোটামুটি একমত নজরুল সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং মেসোপটেমিয়ায় যাননি। কিন্তু করাচি সেনানিবাসে অবস্থানকালে যুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ, বহুজাতিক মানুষের সান্নিধ্যলাভ ও পারস্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তাঁর সাহিত্যজীবনে রেখেছিল সুদূরপ্রসারী অবদান । তাঁর কাব্য ও গল্পে প্রেমের উচ্ছ্বাস ও করুণ রসের আধিক্যের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল পার্সি সাহিত্যের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। পার্সি কবি হাফিজের কবিতার সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর মানসিক সম্পৃক্তি। এর উল্লেখ পাওয়া যায় *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* গ্রন্থের মুখবন্ধে। এ থেকে বলা যায়, সুফিবাদ ও মরমিবাদও তাঁর

স্বোপার্জিত সম্পদ। জীবনের প্রতিটি বাঁক থেকে তিনি সাহিত্যের উপাদান অর্জন করেছেন। বলা যায়, নজরুলের সৈনিকসত্তা তাঁর সাহিত্যজীবনের এক বড় শক্তি। এর প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গল্পে। 'তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ব্যথার দান*-এর কোনো কোনো গল্প নতুন আবহ তৈরির সাফল্যে প্রশংসিত হয়েছিল।' (আজম ২০১৭ : ২৫৯) এই গল্পে নায়কের নাম দারা হলেও নজরুল 'নুরন্নবী' বা 'নুরু' হিসেবেই প্রথমত লিখতে শুরু করেছিলেন। *বাঁধন হারা* (১৯২৭) উপন্যাসে আরও এক নূরুকে পাওয়া যায়, যে মূলত নজরুলেরই প্রতিরূপ। এখানে আরও একটি তথ্য জানিয়েছেন নজরুলের অন্যতম রাজনৈতিক সহচর মুজফ্ফর আহমদ। ১৯১৭-এর রুশ-বিপ্লব নজরুলকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার দৃষ্টান্ত মেলে 'ব্যথার দান' গল্পে। গল্পে 'মুক্তিসেবক সৈনিক দলে' সয়ফুলমুল্ক ও দারার যোগাদান-বার্তা মূলত রুশ বিপ্লবীদের দল 'লালফৌজে' যোগদানের সমার্থক। কারণ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' গল্পটি প্রকাশের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 'মুক্তিসেবক সৈনিক দলে'র জায়গায় 'লালফৌজ'ই লেখা ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-ভারতে 'লালফৌজ' কথা উচ্চারণ করাটাও দোষের ছিল। (মুজফ্ফর ১৯৭৩ : ১৬৩) অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র নজরুলকে আন্তর্জাতিক ঘটনা ও চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিতে রচিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'কে বলা যেতে পারে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প। প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৯১৯ সালে। এই গল্পটি 'বাঙ্গালী পল্টনের এক বওয়াখাটে যুবকের আত্মকাহিনী' হিসেবে প্রথমে রচিত হয়েছিল। (কাদির ১৯৮৯ : ২০০) এই গল্পে যে ছন্নছাড়া যুবকের জবানি পাওয়া যায়, তাতে তার মাতার প্রয়াণ, রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ-স্কুলের পাঠগ্রহণ, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে পল্টনে যোগদানের সঙ্গে নজরুলের জীবনকে মিলিয়ে নিলে উক্ত বাউণ্ডেলের মধ্যে এক বেপরোয়া নজরুলকে আবিষ্কার করা যায়। *বাঁধন হারা*র নুরুর মধ্যেও বিদ্রোহী নজরুলের প্রকাশ স্পষ্ট। তবে এখানে স্ত্রী রাবেয়া ও সখিনার বিয়োগ-ব্যথা গল্পকে করুণ রসে সিক্ত করেছে। 'হেনা' গল্পেও যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা। বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানে যুদ্ধরত সোহরাব ও হেনার ব্যক্তিত্বের টানাপড়েন যুদ্ধের পটভূমিতে একটি কাব্যময় রূপ লাভ করেছে। আবুল ফজলের মতে, 'হেনা' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে বহন করে এনেছে পুরোপুরি যুদ্ধের চিত্র ও আবহাওয়া। এই গল্পে যৌবনের উল্লাস ও মান-অভিমানের সঙ্গে মিশেছে মনোরম বর্ণনা-কৌশল ও বাঙালি পাঠকের অপরিচিত যুদ্ধপরিবেশ। (ফজল ১৩৮২ : ৬৪) অর্থাৎ যুদ্ধ ও সৈনিকতা নজরুলের সাহিত্যসৃজনীর বড় নিয়ামক। যুদ্ধের আবহ বাঙালি পাঠককে দেয় নতুনতর স্বাদ। 'নজরুলের সৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ ফল মধ্যপ্রাচ্য গমন কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ নয় বরং সাহিত্যিক জীবনের উদ্বোধন।' (রফিকুল ২০১৫ : ৪৬) নজরুল সৈনিকজীবন বরণ করেছিলেন বলেই কবিতায় যেমন পাওয়া যায় 'টর্পেডো', 'ভাসমান মাইন' (বিদ্রোহী',অগ্নি-বীণা), লেফট! রাইট! লেফট!!! লেফট! রাইট!

লেফট!!! ('কামাল পাশা', *অগ্নি-বীণা*), তেমনি 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'ঘুমের ঘোরে', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্প থেকে পাই 'গোলা', 'বোমা', 'তোপ', 'দ্রুম দ্রুম', 'ফরজন্দ', 'সিপাই', 'তল্ওয়ার' ইত্যাদি সামরিক শব্দমালা, যা অনায়াসে বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের অবয়ব গঠনের কালে যা ছিল অকল্পনীয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আজমের বক্তব্য :

> নজরুলের সাহিত্যকর্মের একেবারে আকর উপাদান হিসেবে আরবি-ফারসি-তুর্কি উপকরণে বহুলতা তাই কেবল তাঁর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না; ব্যক্তিগত ইতিহাস ও প্রস্তুতির ইতিবৃত্তকেও আমলে আনতে হবে। (আজম ২০১৭ : ২৫৯)

অর্থাৎ নজরুলের সাহিত্যপাঠ তাঁর জীবনপাঠের সমান্তরাল স্রোতে অগ্রসর হয়।

**পাঁচ.**

মিথের ব্যবহারে নজরুলের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। ভারতীয় মিথ ও পশ্চিম এশীয় মিথের পৃথক ব্যবহার, আবার কখনও উভয়ের মিথস্ক্রিয়ায় নজরুলের সাহিত্য হয়ে ওঠে অনবদ্য। জীবনের ভেতর থেকে প্রাপ্ত এ পুরাণজ্ঞান নজরুলের আন্তরিকতায় রূপ পায় ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায়। তাঁর গল্পের পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই বেশির ভাগ চরিত্র মুসলিম ধর্মবলম্বী, এবং সমাজটাও মুসলিম সমাজ। আবার মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্হস্থ্য-জীবন অঙ্কনে তিনি ব্যবহার করেন ভারতবর্ষীয় প্রতীক। যেমন, 'পদ্ম-গোখ্রো' গল্পে মীর বাড়ির সৌভাগ্য-বধূ আরিফপত্নী জোহরার পদ্মগোখরো আবিষ্কার ও সন্তানবাৎসল্যে তাদের কাছে টেনে নেওয়া দিয়ে গল্পের শুরু। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত বিষয় আছে, কিন্তু বর্ণনাগুণে ও লেখকের আন্তরিকতায় তা পাঠকের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এই সাপ-প্রতীক ব্যবহারের নেপথ্যে নজরুলের ভারতবর্ষীয় মিথ সম্পর্কে সজ্ঞানতার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে সিরাজ সালেকীন তাঁর *নজরুল-টোটেম* গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

> এই গল্পের মর্মে নাগ-সর্প-বিষ ও জীবন-সম্পর্কে অমৃত প্রাপ্তির রূপকার্থ আছে ... গল্পের নামেই পদ্মের ব্যবহার বিদ্যমান, অষ্টনাগের একজন এই পদ্ম; ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে জনমণ্ডলীর কেন্দ্র দখলের প্রতীকতা আছে এতে। (সিরাজ ২০১৫ : ৭৫)

সাপদুটিকে কেন্দ্র করে জোহরার ব্যক্তিত্ব যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোটিও উন্মোচিত হয় সাপকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় মিথচেতনায় সর্প পূজনীয়, সম্পদপ্রাপ্তির ইঙ্গিত। নজরুল তাঁর গল্প বলার মুন্সিয়ানায় এই মিথকে স্থাপন করলেন এক সাধারণ মুসলিম পরিবার-কাঠামোতে। 'এমনিতে সরল ও রূপকথাধর্মী, আমাদের স্মৃতিতে থাকা কথামালার সাযুজ্য নিয়েই কাহিনি সংগঠন অথচ পরিণামে বা বয়নের নকশায় ভারতবর্ষীয় সমাজ ও ব্যক্তির অবচেতনের সত্যকে উন্মোচন করে

গল্পটি।' (সিরাজ ২০১৫ : ৭২) 'জিনের বাদশা' গল্পে চানভানুকে পাবার জন্য আল্লারাখার যে দুরন্তপনা দেখা যায়, সেখানেও কৃষ্ণ-মিথের আবিষ্কার কষ্টকর নয়।

নজরুলের প্রথম দিককার গল্পে পারস্যের কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের প্রভাবে সুফিবাদের অনুষঙ্গ লক্ষযোগ্য। যেমন, 'ব্যথার দান' গল্পে বেদৌরাকে মাশুক আর দারাকে আশেকের ছাঁচে ফেলে তাদের পরস্পরের আর্তিকে সুফিবাদের আধ্যাত্মিক দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। এই জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক বৈষ্ণবসাহিত্যেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। পার্থক্য শুধু এই যে, বৈষ্ণবতত্ত্বে জীবাত্মা রাধা নারী তথা প্রণয়িনী আর পরমাত্মা কৃষ্ণ পুরুষ, প্রেমিক; আর সুফিবাদে প্রেমিক জীবাত্মা আর পরমাত্মা তার প্রেমিকা। বৈষ্ণবতত্ত্বে এই সম্পর্ক পরিণতি পায় দৈহিক মিলনাকাঙ্ক্ষায়; সুফিবাদে তা-ই অদ্বৈতবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মানবিক বিরহের প্রকাশ অভিন্ন। তাই যখন দারা স্বগতোক্তি করে :

> বিরহের ব্যথায় জান্‌টা যখন 'পিয়া পিয়া' বলে 'ফরিয়াদ' ক'রে মরে, তখনকার আনন্দটা এত তীব্র যে, তা একমাত্র বিরহীর বুকই বোঝে, তা প্রকাশ ক'রতে আর কেউ কখ্‌খনো পারবে না। দুনিয়ায় যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হ'চ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়।

তখন অনায়াসেই মিলিয়ে নেয়া যায় রাধার বিরহকে। আবার 'বাদল-বরিষণে' গল্পে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে যে বর্ষাকে পাওয়া যায়, তা একান্তভাবেই রাধার বিরহ-বর্ষা। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

> আবার সেই সন্তাপহারী আমার চিরবাঞ্ছিত মেঘ গুরু-গরজনে ডেকে উঠল। বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে ময়ূরের কেকা-ধ্বনির সাথে চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন রণিয়ে রণিয়ে উঠছিল, – "দে জল দে জল!" হায় রে চিরদিনের শাশ্বত পিয়াসী! তোর এ অনন্ত পিয়াসা কি সারা সাগরের জলেও মিটল না?

এই বক্তব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলির বিদ্যাপতির এই পদটি পড়া যেতে পারে :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
ঘরি বিনে দিন রাতিয়া॥ (হাই ২০০৮ : ১৫৭)

'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পেও প্রিয়তমা মানসীর কাছে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মৃত্যুপথযাত্রী 'ধূমকেতু' ছদ্মনামের এক রাজবন্দীর চিঠি থেকে মাশুকের প্রতি আশেকের নিবেদন প্রকাশ পায়, হয়ে ওঠে যেন এক দীর্ঘ গদ্যকবিতা। একই কথা 'দুরন্ত পথিকে'র বেলাতেও প্রযোজ্য হবে। 'রিক্তের বেদন' গল্পে নায়ক একজন সৈনিক, বাঙালি যুবক। গুল নামক এক বেদুইন নারী নায়কের প্রণয়প্রার্থী। যেহেতু সে বেদুইন, তাই প্রেম প্রকাশে সামাজিক কপটতা নেই তার মধ্যে। একদিকে কর্তব্যবোধ অন্যদিকে প্রেমধর্ম এই দুয়ের দ্বিধায় নায়ক দীর্ণ। কিন্তু কর্তব্যবোধকে সে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই তারই বন্দুকের গুলিতে রক্তাক্ত গুলকে জড়িয়ে রাখে সে। মৃত্যুর আগে চিরায়ত প্রশ্ন উচ্চারণ করে গুল, 'এই আশেকের হাতে মাশুকের মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন?' মৃত্যুর প্রাগ্মুহূর্তে গুল তাঁর প্রেমিককে বলছে 'হাসিন' অর্থাৎ সুন্দর!

নজরুলসাহিত্যে মিথ-ব্যবহারের এই মিথস্ক্রিয়াকে সমালোচক বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে :

> নজরুলের কালে তাঁর সম্প্রদায়গত অধিকার ও বিশ্বাসে, ঐতিহ্যের শক্তিময় নিকট উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা ছিল নিগূঢ়। সে ঐতিহ্যিক উৎসকে সদর্থক কাব্য-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আবার অন্যদিকে দেশজ ঐতিহ্য, লোকমিথ এবং নৃ-তাত্ত্বিক-ভৌগোলিক উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতীয় মিথের জগতেও ছিলো তাঁর সৃষ্টিশীল পরিক্রমণ – যা কখনো চেতনে-অবচেতনে, কখনো-বা সামূহিক নির্জ্ঞানে শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। (রফিকউল্লাহ ১৩৯৮ : ১৬১)

অর্থাৎ নজরুলের মিথ-ব্যবহার আরোপিত কোনো বিষয় নয়। বলা যায়, একজন বাঙালি লেখক নিজ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হিসেবে যে মিথচেতনাকে ধারণ করেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের গল্পসাহিত্যে। মিথ প্রত্নপ্রতিমার মতো নজরুলের গল্পের কাঠামোতে বিদ্যমান থাকে।

**ছয়.**

নজরুলের গল্পে বেশ কিছু সক্রিয় নারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। এই নারীরা কেউ প্রণয়িনী, কেউ বেদুইন গুপ্তচর, কেউ গৃহলক্ষ্মী, কেউ দাবাড়ে, কেউ দৃঢ়চেতা, কেউ বা

স্বামী হন্তারক। নারী এখানে উপলক্ষ হিসেবে আসেনি, এসেছে কেন্দ্রস্থ লক্ষ্য হিসেবে। যেমন, 'ব্যথার দানে' দুই দফায় এসেছে বেদৌরার কথা। অর্থাৎ নারীর বক্তব্য আছে, নারী বলতে চায় এবং নারী বলছে। 'রিক্তের বেদনে'র শহিদা স্মৃতি হিসেবে থাকলেও জীবনবাদী বেদুইন নারী গুল দুঃসাহসী ও প্রেম প্রকাশে অকপট। 'রাক্ষুসী' গল্পে পতিগত-প্রাণা বাগদি-রমণী বিন্দি পরকীয়াসক্ত স্বামীকে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে হত্যা করে। তার জেল হয়। সমাজে বিন্দি পরিচিত হয় রাক্ষুসীতে। জেল থেকে ফিরেও তার মুক্তি মেলে না। রাক্ষুসীর মেয়ে বলে তার কন্যাকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। পুত্র আশ্রয় দিয়েছে বলে তাকেও একঘরে করে রাখে সমাজ। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত বিন্দির প্রশ্ন : 'আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি – আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন।' একজন প্রান্তিক নারীর ভেতর থেকে এক আধুনিক নারীকে তুলে এনেছেন নজরুল। সমালোচক আবু রুশ্‌দের মতে, নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প হলো 'রাক্ষুসী'। (রুশ্‌দ ১৯৯২ : ১৫০) 'পদ্ম-গোখ্‌রো' গল্পে জোহরাই সবার কেন্দ্রে। কারণ সে পয়মন্ত। লালন করে সম্পদের যক্ষরূপী দুই পদ্মগোখরোকে। গৃহলক্ষ্মী হয়েও যে নারী সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জোহরা। 'অগ্নি-গিরি'র নিরীহ সবুরের মধ্যে অগ্নিস্ফূরণ ঘটাতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ও দুঃসাহসী হতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল নূরজাহান। আর 'শিউলিমালা' গল্পের শিউলির কাছ থেকে মেলে আধুনিক, বিদগ্ধ ও বিদুষী নারীর পরিচয়। নারীর প্রতি নজরুলের সাম্য-নীতি যেমন তাঁর কবিতায় বিদ্যমান, তেমনি গল্পসাহিত্যেও নজরুলের নারীরা সক্রিয় ও সজীব।

## সাত.

নজরুলের গল্প স্থানিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। 'গল্পের স্থান ও জীবন-ধারা নির্বাচনে লেখক বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে মধ্য-প্রাচ্য-সংস্কৃতির আমেজ প্রবর্তন করে সাহিত্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।' (রাজিয়া ২০০০ : ৭৪) এই বৈচিত্র্য নজরুলের জীবনাভিজ্ঞতার সমান্তরালেই বিবেচ্য। প্রথম দুই গল্পগ্রন্থের বেশিরভাগ গল্পের স্থানিক পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র। 'ব্যথার দান' গল্পে গোলেস্তান, চমন, বোস্তান; 'হেনা' গল্পে ফ্রান্সের ভার্দন ট্রেঞ্চ, প্যারিস, হিন্ডেনবার্গ লাইন, বেলুচিস্তান, কাবুল প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। 'ঘুমের ঘোরে' গল্পে আছে আফ্রিকার সাহারা মরূদ্যানের কথা। নজরুল যে সশরীরে সব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন, তা নয়। একে বলা যায় তাঁর মানস-ভ্রমণ। কবির কল্পনায় ও রচনাগুণে পাঠকের কাছে তা জীবন্ত মনে হয় এবং পাঠক ভ্রমণ করতে পারে পৃথিবীর বিচিত্র প্রান্তে। বীরভূম, কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল, মধুপুর, ঝিলম্, করাচি, লাহোর সব জায়গায় তার যেন অবাধ যাতায়াত। আবার পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থান যেমন কুর্দিস্তান, কারবালা, আজিজিয়া, কুতল্-আমরা ইত্যাদিও স্থানিক পটভূমি হিসেবে নজরুলের গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। 'নজরুলই প্রথম বাংলা গল্পকে ব্যাপকভাবে বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বাইরের পটভূমিতে আর চরিত্রে

স্থাপন করেছেন।' (আতোয়ার ১৯৯৪ : ২৭) স্থানিক পরিক্রমণের পাশাপাশি তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন স্থানিক জনমানুষ ও তাদের নিজস্ব ভাষার ব্যবহারেও। যেমন : 'রাক্ষুসী' গল্পে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বাগদিদের জীবন ও ভাষারীতি। *শিউলিমালা* গ্রন্থের গল্পগুলোতে দেখা যায় পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের ভেতরকার নানা স্থানের পরিচয়। যেমন, 'পদ্ম-গোখ্‌রো' গল্পে রসুলপুর বলে যে গ্রামের উল্লেখ আছে, তা বাংলা অঞ্চলের একটি গ্রাম। 'জিনের বাদশা'তে আছে ফরিদপুরের কথা; 'অগ্নি-গিরি'তে আছে ত্রিশাল অর্থাৎ ময়মনসিংহ; 'শিউলিমালা'র শিলং, সেটাও বাংলাসংলগ্ন। এই পর্বে নজরুল তাঁর গল্পের ভাষা-নির্বাচনে, বাক্য-বিন্যাসে, চরিত্রের সংলাপে ব্যবহার করেন পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষা, লোক-উপাদান, প্রবাদ-প্রবচন। ফলে *শিউলিমালা*-পর্বের গল্পগুলোতে পাওয়া যায় পূর্ববাংলার কিছু রং। নজরুলের এই বিপুল চরাচর কেবল স্থানিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ওই স্থানের মানুষ-জনজীবন-সংস্কৃতি গল্পকাঠামোতে মিশে যায়।

**আট.**

নজরুলের গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাঙালি মুসলমানের জীবন ও সমাজের রূপায়ণ এবং তাদের ভাষা-নির্মাণ। বাঙালির ভাষা-নির্মাণে ও ইতিহাস-গঠনে দীর্ঘকাল যে অংশটি ছিল পর্দার আড়ালে, সেই অংশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে নজরুল স্বসমাজের ও স্ব-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে; কবিতায় তো অবশ্যই, গল্পেও। সেদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মুসলমানের লেখক। মুজীবুর রহমান খাঁ-র মতে, 'বাংলা সাহিত্যের মুসলমান গল্প-লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান কেবল পয়লা পংক্তিতে নয়, সর্বপ্রথম।' (মুজীবুর ১৯৫৯ : ৮০) এখানে 'মুসলমান' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে না দেখে নজরুলের স্বসমাজ ও নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মপরিচয়ের সংযোগ ও প্রকাশক হিসেবে বিবেচ্য। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, নজরুল বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের প্রথম স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। (মান্নান ২০০৮ : ১৮) কারণ এর আগেও মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নজিবর রহমানসহ আরও বেশ কয়েকজন মুসলিম লেখক বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু সমকালের বাঙালি মুসলমান তাদের কথাসাহিত্যে স্থান পায়নি। দূর-অতীতের আদর্শায়িত ঐতিহাসিকতা নিয়েই ছিল তাঁদের কারবার। তাই এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বরও তাঁদের গল্প-উপন্যাসে স্থান পায়নি। 'বস্তুত প্রথম নজরুল ইসলামেই এসে আমরা পেলাম বাস্তবের রক্তমাংসের কয়েকটি মানুষ – যাদের মধ্যে জীবনের বাঁচার পিপাসা মূর্ত হয়েছে।' (আনোয়ার ১৯৮১ : ৩২৪) এ-কথা তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা বলেন : 'নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাহীন' পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন।' (ছফা ২০০২ : ১৩১) তবে নজরুল

বাঙালি মুসলমানের লেখক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, উত্তীর্ণ হয়েছেন বাঙালি লেখকে। বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন, ভাষাভঙ্গি, উৎসব-আনন্দ, বিরহ-বেদনা, গার্হস্থ্যজীবন ইত্যাদিকে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি বাংলা সাহিত্যকেই পূর্ণতা দান করেছেন। এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের ধারায় ঘুচিয়ে দিয়েছেন একের সঙ্গে অপরের অপরিচয়ের সংকট। নজরুলের পক্ষে হয়তো তা সম্ভব হয়েছে তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান বলে। নিজের যাপিত জীবন, পরিপার্শ্ব, পারিবারিক কাঠামো ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে করে তুলেছে স্বকীয় ও জনজীবনলগ্ন। যেমন, 'পদ্ম-গোখ্‌রো'তে পাওয়া যায় বাঙালি মুসলমানের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। 'জিনের বাদশা'তে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের গ্রাম তথা ফরিদপুর অঞ্চলের গ্রামীণ মুসলমানদের জীবনাচরণের চিত্র। 'অগ্নি-গিরি'তে গ্রামীণ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জীবন ও মানসিক প্রবণতা। কিন্তু সবকিছুর পরে এটিই সত্য যে, মুসলিম জীবনের পরিচয় দিলেও তা মিশে যায় চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির মহাস্রোতে। একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা-নির্মাণ করার প্রয়োজনেই নজরুলকে অবলম্বন করতে হয়েছিল স্বকীয় রীতি-পদ্ধতি। আর একারণেই তাঁর গল্পসাহিত্যও প্রচলিত ধারার মধ্যে নতুন স্বর নিয়ে আবির্ভূত হয়।

**নয়.**

নজরুলের সাহিত্যযাত্রার প্রারম্ভেই দেখা যায় এক 'আমি'র দোর্দণ্ড প্রতাপ, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ। এই 'আমি' কে? শিল্প ও সাহিত্যে 'আমি'র প্রকাশ মূলত আত্মগৌরব অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূত্র ধরে। আঠারো শতকের শেষে – কোলরিজের *লিরিক্যাল ব্যালাড* (১৭৯৮) প্রকাশ থেকে শুরু করলে – পশ্চিম ইয়োরোপে জাগরণ ঘটে আমিত্বের, যা জন্ম দেয় রোম্যান্টিকতার। আবিষ্কৃত হতে থাকে শিল্পীর আত্মসন্ধান, আত্মপ্রকাশ ও আত্মউন্মীলনের নতুন নতুন ধারা ও পথ। সেই সূত্রে বলা যায়, *অগ্নি-বীণায়* (১৯২২) যে আমিত্বের সরব প্রকাশ ঘটেছে, তার অন্তর্দেশে আছে রোম্যান্টিক চেতনা; এবং তা আরোপিত নয়, বরং সময়ের সাবলীল সৃষ্টি। "বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্পপ্রতিনিধি।" (বিশ্বজিৎ ১৯৯৩ : ১৭) একইভাবে এই আমিত্বকে দেখা যায়, *ব্যথার দানের* গল্পসমূহে। 'আমি'-সত্তার উপস্থিতি মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি-নজরুলের উপস্থিতি। এছাড়া *রিক্তের বেদনেও* স্বগতোক্তি ও 'আমি'চেতনার প্রাধান্য। সেখানে উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয় চরিত্রের সংবেদনা, আবেগ ও বিরহের হাহাকার; কেন্দ্রে অবস্থান করে কথক নিজেই। এই রোম্যান্টিক চেতনার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি-নজরুলকে।

**দশ.**

কাজী নজরুল ইসলামের গল্পকার সত্তায় সবসময় মিশে থাকে তার কবিসত্তা। কবিসত্তার বিদ্রোহ ও প্রেম গল্পে এসে লীন হয়ে যায় কারুণ্যে ও বিরহে। তাই

স্বাভাবিকভাবেই প্রেম-প্রকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা যায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের উপস্থিতি। আবেগ-উচ্ছ্বাসের বহুলতা নিয়ে অনেকের বিরূপ সমালোচনা থাকলেও সমালোচক দেখেছেন তার ইতিবাচক প্রান্তটিকেও :

> প্রত্যেকটি গল্পেরই ঘটনা ভাষা এবং পরিবেশ এমন একটি আন্তরিক বেদনায় রঙিন যে, পড়তে বসলে মনটা এক মুহূর্তেই স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। প্লটের গাঁথুনি, ঘটনার বাস্তবতা, কাহিনীর গুরুত্ব ইত্যাদি কোনোদিকেই আর খেয়াল থাকতে চায় না। (আতোয়ার ২০০০ : ৪৫৯)

অল্প বয়স থেকেই নজরুল গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন; তাই হয়তো প্রতিষ্ঠিত রীতির সঙ্গে তিনি প্রথমত পরিচিত ছিলেন না এবং একারণেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ধারায় গল্প লেখেননি – এমন ব্যাখ্যাও কোনো কোনো সমালোচকের মধ্যে চালু আছে। আর তা যদি হয়েও থাকে, তবে এই অপরিচয়ের ফলেই নজরুল বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে পেরেছিলেন সতেজ গল্পপাঠের স্বাদ। কিন্তু, সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে নজরুলের সজ্ঞান বিবেচনাবোধ নিশ্চিতভাবেই ছিল। প্রচলিত রীতির বিপরীতেই যে তিনি লিখছেন, তা নিজেই তাঁর একাধিক লেখায় উল্লেখ করেন। যেমন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লেখা এক চিঠিতে নজরুল বলছেন, 'আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।' (নজরুল ২০১৫ : ৬৩) তাঁর মতে, সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কলগান ও চঞ্চলতা। (নজরুল ২০১১ : ৩১) 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধেও সাহিত্যধারায় নজরুল তাঁর প্রবণতা ও অবস্থানকে সুচিহ্নিত করতে পেরেছেন। আর একারণেই দেখা যায়, নজরুলের কবি-সত্তা কখনও কখনও গ্রাস করেছে তাঁর গল্পকার-সত্তাকে। কবি-সত্তার প্রাধান্য চোখে পড়ে তাঁর গল্পের বাক্যবিন্যাসে এবং নানা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজের গান ও কবিতার ব্যবহারে।

এখন প্রশ্ন হলো, নজরুলের গল্প কি উত্তরসূরিদের জন্য কিছুই রেখে যায়নি? উত্তর : রেখে গেছে। প্রথমত, রেখে গেছে একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা। দ্বিতীয়ত, প্রচল ফর্ম থেকে বেড়িয়ে নিজস্ব ফর্ম নির্মাণের সাহস। তৃতীয়ত, বহির্বাস্তবতাকে স্বীকার করে অন্তর্বাস্তবতার দিকে যাত্রা। চতুর্থত, নতুনের আবাহন, নতুন স্বরায়ন। এ-প্রসঙ্গে আবু রুশ্‌দ বলেছেন, 'গল্পলেখক নজরুলের প্রভাব আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তারাশঙ্কর থেকে শওকত ওসমান পর্যন্ত বিস্তৃত।' (রুশ্‌দ ১৯৯২ : ১৫২) এ-কথায় হয়তো খানিকটা আতিশয্য আছে, কিন্তু নজরুলের গল্পকার সত্তার ভূমিকাকে উত্তরপ্রজন্ম নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারে না।

প্রচলিত মাপকাঠিতে নজরুলের গল্পের সীমাবদ্ধতা অনেক – ব্যক্তি-'আমি'র প্রাধান্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, আবেগের ঘনত্ব, গদ্যে কবিত্ব ইত্যাদি। পরিশেষে কেবল এই কথাটি

বলে রাখা যায় – প্রচলিত মানদণ্ডে যেগুলো নজরুলের সীমাবদ্ধতা, অন্য বিবেচনায় সেগুলোই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য।

## আকর-গ্রন্থ

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৬)। *নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

## উল্লেখপঞ্জি


বেগম আকতার কামাল (১৪০৭)। *বিশ্বযুদ্ধ, জীবন ও কথাশিল্প*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০১৭)। 'সৈনিকতা ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম', *সৃষ্টি সুখের উল্লাস* (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আতোয়ার রহমান (১৯৯৪)। *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

আতোয়ার রহমান (২০০০)। 'নজরুলের ছোটগল্প', *নজরুল সমীক্ষণ* (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

আনোয়ার পাশা (১৯৮১)। *আনোয়ার পাশা রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড* (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল হক (১৯৬০)। 'নজরুলের গল্প ও উপন্যাস', *নজরুল-সাহিত্য* (মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত), রওনক পাবলিকেশান্স, ঢাকা

আবদুল কাদির (১৯৮৯)। *নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

আহমদ ছফা (২০০২)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১১)। *নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র* (সম্পাদনা : মোহাম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৫)। *নজরুলের পত্রাবলি* (সম্পাদনা : শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

আবুল ফজল (১৩৮২)। *বিদ্রোহী কবি নজরুল*, বইঘর, চট্টগ্রাম

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৩)। *নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০৮)। *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুজফ্ফর আহমদ (১৯৭৩)। *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, মুক্তধারা ঢাকা

মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯৫৯)। 'গাল্পিক নজরুল', *নজরুল-পরিচিতি*, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্, ঢাকা

মোবাশ্বের আলী (১৯৬৯)। *নজরুল প্রতিভা*, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (১৩৯৮)। 'নজরুলের কবিতায় মিথ-ঐতিহ্যের ব্যবহার', *সাহিত্য পত্রিকা* (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), পয়ত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম (২০১৫)। *নজরুল-জীবনী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

রাজিয়া সুলতানা (২০০০)। *কথাশিল্পী নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

আবু রুশ্‌দ (১৯৯২)। 'নজরুলের ছোট গল্প', *নজরুল-সমীক্ষা* (রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত), নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিরাজ সালেকীন (২০১৫)। *নজরুল-টোটেম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সুশীলকুমার গুপ্ত (১৩৮৪)। *নজরুল-চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা

মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ (সম্পা. ২০০৮)। *মধ্যযুগের বাংলা কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।